কবি টেনিসন-কে গালাগালি দিতাম

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

তখন স্কুলে পড়ি। বাড়ির শাসন খুব কড়া ছিল। নির্দেশ জারি ছিল: রবিবার দুপুরে বাড়ি থেকে একদম বেরনো যাবে না। বাবার ধারণা ছিল দুপুরবেলা যারাই বেরোয় তারাই বখে যায়। আমাকে বেরোতে দেওয়া তো হতই না, বরং একটা অত্যন্ত কঠোর ও খারাপ কাজ করতে দেওয়া হত। সেটা হচ্ছে টেনিসনের কবিতা অনুবাদ করা। দুটো উদ্দেশ্য। দুপুরটা আটকে রাখা, আর যদি ইংরাজি শেখানো যায়। যদিও এ জিনিস বেশি দিন আমাকে দিয়ে কেউই করাতে পারেনি, তবু যে ক'দিন করতে হয়েছে, মনে মনে টেনিসনকে যে কত গালাগালি দিয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। রবিবার ছিল টেনিসনের গালাগালি খাওয়ার দিন।

আমি তেমন ভাবে খাদ্যরসিক না হলেও বরাবরই আমাকে বাজার করতে হত, রেশনও। রেশন দিত রবিবার। তাই রবিবারের বাড়তি আকর্ষণ ছিল। বাজার থেকে চার আনা আট আনার চেয়ে বেশি সরাতে না পারলেও রেশন থেকে দু'তিন টাকা অনায়াসে সরাতাম। সেই পয়সা দিয়ে কবিতার বই কিনতাম। জীবনানন্দ দাশের প্রথম বই 'সাতটি তারার তিমির' ওই ভাবে তিন টাকা সরিয়ে কেনা।

উত্তর কলকাতায় থাকতাম তো, অতি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে, জুতোটুতো পরা যেত না, জামা-প্যান্টের কোনওটারই অবস্থা খুব ভাল ছিল না। এই অবস্থায় জীবনে প্রথম এক জন বিখ্যাত ও ধনী ব্যক্তির বাড়ি গিয়েছিলাম। তিনি তখনকার দিনের খুব নামকরা প্রকাশক, 'সিগনেট প্রেস'-এর কর্ণধার দিলীপকুমার গুপ্ত। আমি ও বন্ধু দীপক মজুমদার হঠকারীর মতো এক রবিবার ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। বুঝিনি, জীবনে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটতে চলেছে।

আমাদের যে উনি বাড়িতে ঢুকতে দিয়েছিলেন এবং কথা বলেছিলেন সেটাই অতি আশ্চর্যের বিষয়। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে দুটো মিষ্টি কথা বলে বিদায় করতে পারতেন, কিন্তু উনি আ মাদের ভিতরে নিয়ে বসালেন, তরুণ কবি বলে সম্মান দেখিয়ে 'আপনি' সম্বোধন করলেন। আমরা কবিতার বইয়ের পাণ্ডুলিপি নিয়ে গিয়েছিলাম। অনেক ক্ষণ কথা বলার পরে উনি বললেন, এসো আমরা একটা ক্লাব খুলি যেখানে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা হবে। আরও বললেন, তোমাদের কবিতার বই এক্ষুনি বের করা ঠিক হবে না। তবে, একটা পত্রিকা বের করো না কেন, যেখানে অনেকেরই লেখা থাকবে। সেই থেকে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার জন্ম। তার থেকেও যেটা বড়, তখন 'হরবোলা' বলে একটা ক্লাব হল যেখানে আমি তখনকার বিখ্যাত সব লেখকদের চোখের সামনে দেখতে পেলাম, তাঁদের সান্নিধ্যে এসে নানা বিষয়ে শিখলাম, নানা বিষয়ে আগ্রহ জন্মাল। একটা রোববার আমার জীবনের ধারাটাই ঘুরিয়ে দিল।

একটা বড় ঘটনা বলি। সত্যজিৎ রায় তখন খ্যাতির শীর্ষে, আমি এক জন তরুণ কবি মাত্র, দু'একটা উপন্যাস বেরিয়েছে। এক দিন উনি আমাকে ফোন করলেন। সত্যজিৎ রায় আ মাকে ফোন করবেন, এটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। দেনা শোধ করার জন্য 'জলসা' নামের সিনেমাপত্রিকায় সম্পাদকের অনুরোধে একটা উপন্যাস, তাও হেলাফেলায়, লিখেছি। উনি ফোনে বললেন ওই উপন্যাসটি নিয়ে আমার সঙ্গে একটু আলোচনা করতে চান। আমি ওঁর বাড়ি গেলাম। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞেস করলেন আর সাত দিন সময় নিলেন পাকা কথার জন্য। সাত দিনের অনেক আগেই খবর এল, উনি আমার উপন্যাস নিয়ে ছবি করবেন। 'অর ণ্যের দিনরাত্রি'। সে দিন আমি সারাটা দিন একটা আবেশের মধ্যে ছিলাম, সত্যজিৎ রায় আ মার উপন্যাস নিয়ে ছবি করবেন...। সেটাও ছিল এক রবিবার।

দক্ষিণ কলকাতায় আমার এক বন্ধু শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে রবিবার সন্ধেবেলা সে স ময় বৈঠক বসত। সেখানে কেউ না কেউ নতুন লেখা নিয়ে যেত ও পড়ে শোনাত। আমি ম অনেক দিন কোনও লেখা নিয়ে যাইনি বলে বন্ধুরা চেপে ধরল, একটা শোনাতেই হবে। আমি এক রবিবার বসে বসে একটা গল্প লিখছিলাম ওখানে গিয়ে শোনানোর জন্য। বিকেল শেষ। তখন থাকতাম নাগেরবাজারের কাছে একটা বড় ভাড়াবাড়িতে। হঠাৎ শুনি কারা যেন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। ওপরে আসতে বললাম। দেখি এক ভদ্রলোক, তাঁর সঙ্গে তিনটি বিভিন্ন বয়সের মেয়ে। এক জন বেশ ছোট, অপর দু'জন যুবতী। আসার কারণ, আমার কাছ থেকে 'কৃত্তিবাস' কিনতে চান।

এখন, কৃত্তিবাসের ওই ঠিকানাটা দেওয়া আছে বটে, তবে ওখানে আর কে আসে, যারা কেনে স্টল থেকেই কেনে। আর ভদ্রলোক যে ভাবে কৃত্তিবাস কথাটা বলছেন, বুঝলাম ওই মেয়েদের মধ্যেই কারও কথায় উনি এসেছেন। শোনা গেল এক জন ওঁর স্ত্রী। এ দিকে মে য়েগুলোও কিছু বলছে না। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে কারণ আমাকে তো পাওয়ারও কথা না, নেহাত লিখছিলাম তাই...। যাই হোক, ওঁদের একটু নীচে পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। যাওয়ার আগে বাচ্চা মেয়েটি ও ভদ্রলোকের স্ত্রী বাদে অন্য জন বলল, 'একটা কথা বলব?' আমি ম বললাম, 'বলুন'। মেয়েটি বলল, 'না, থাক'। তখন আমিও যুবক, মেয়েটিও যুবতী, কথাটা শোনার জন্য আগ্রহ বেড়ে গেল। পরবর্তী সময় অনেক বার ওর সঙ্গে দেখা হল। আসলে ও-ই গিয়েছিল 'কৃত্তিবাস' কিনতে। ওই মহিলাই এখন আমার স্ত্রী!